কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07. APR. 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ... ৫ ...

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

শিক্ষায় বিনিয়োগ

শিক্ষা মানুষকে চক্ষুষ্মান করে, শিক্ষায় মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে। শিক্ষা মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, সবাক, সকর্ম করে তোলে। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই, জাতীয় জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগেরও তাই কোনো বিকল্প নেই। তবে কেমন বিনিয়োগ, কতটা বিনিয়োগ, বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ও উদ্‌যাপনের উপায় কী–এ বিষয়গুলো পর্যালোচনায় আনা বা আসার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। এটি কি মহাজন বাক্য হিসেবে উচ্চারণে শুধু সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে? জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা কিংবা রাখার দায়িত্ব কার? শিক্ষার বাজেট বা বরাদ্দ বা বিনিয়োগবিষয়ক সংখ্যার হিসাব-নিকাশ নিয়ে যত তর্ক-বিতর্ক এবং এতৎসংক্রান্ত দাবিদাওয়া পেশের মধ্যে যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, যা বা যতটুকু বরাদ্দ মেলে, সেই অর্থ যথাযথ কাজে, যথা-উপায় অবলম্বন করে, যথাফল লাভের পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারটা ততটা আমলে আসে না।

একটি বৃক্ষকে সত্যই সবল ও সুস্থ হয়ে বড় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃত পরিচর্যা প্রয়োজন। এ সময়টা দেখভালের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য জরুরি ও আবশ্যক যে এ পর্যায়ে কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত হলে পরবর্তী পর্যায় তথা অপরাপর অংশে সংক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠবে এবং একসময় গোটা গাছটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা পরীক্ষাব্যবস্থাকে মূল্যায়নমুখী করছি না, দেখছি পাস বা গ্রেডনির্ভর; আর এর পরিসংখ্যান পরিব্যাপ্তির প্রাগ্রসরমাণতা দেখে পরিতৃপ্তি বোধ করছি। মশহুর ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের অ্যাংশিয়েন্ট মেরিনার যেমন সমুদ্রে চারদিকে থইথই করা অপানযোগ্য পানি দেখে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেননি (Water water everywhere, nor any drop to drink), তেমনি লাখো কোটি শিক্ষিতের মধ্যে উপযুক্ত চাকরিপ্রার্থী মিলছে না। উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তির দুয়ারে গিয়ে অপারগ অনেককেই ঠায় দাঁড়ানো দেখতে হচ্ছে।

শিক্ষা মূল্যবোধকে জাগ্রত করার কথা, মূল্যবোধ অবক্ষয়ের উপলক্ষ হওয়ার কথা নয়। এখানেই আমি লাগসই প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গটির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাই। শিক্ষার্থীর মনে ভালোমন্দ জ্ঞানের বিকাশ, দায়দায়িত্ববোধ, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার আচরণের উদ্‌গাতা ও উপলক্ষ উপলব্ধি, পারঙ্গমতা তথা দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য যদি না হয় শিক্ষা; বরং শিক্ষা যদি হয় ঠিক বিপরীত সব অবস্থা-ব্যবস্থা, তার চেয়ে দুঃখজনক অবস্থা আর কী হতে পারে? প্রযুক্তি শিক্ষা উৎকর্ষ অর্জনের জন্য, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন পথে নতুন উদ্যমে সময় ও সামর্থ্যকে সাশ্রয়ী করে তুলে অধিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য। শিক্ষা ও প্রযুক্তি যদি অসৃজনশীল অপচয় অপব্যয় অপ-অভ্যাস গড়ে তোলার পথ পায়, তাহলে তো সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে, ১৮৯৯ সালে, ঔপনিবেশিক শাসন আমলে, এ দেশেরই একজন সরকারি স্কুল পরিদর্শক, আহ্‌ছানউল্লাহ (পরবর্তীকালে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লাহ) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, নিজের সঙ্গে আহারাদি পাচকসহ পরিপাকের উপায় উপকরণ বয়ে নিয়ে তিনি স্কুল পরিদর্শন করতেন। পরিদর্শিতদের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া কোনো প্রকার পরিষেবার সুযোগ তিনি নিতেন না। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রণীত তাঁর প্রতিবেদন সুদূরপ্রসারী মূল্যায়নধর্মী ফলাফল নিয়ে আসত। ঠিক এ অবস্থার বিপরীতে এই অতি সাম্প্রতিককালেও যদি দেখা যায়, দেশের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা খোদ ঢাকায় বসে ৬০০ কিলোমিটার দূরের কোনো শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষককে তাঁর 'পরিদর্শন ছক' পূরণ করে 'টাকা' নিয়ে কেন্দ্রে আসতে বলছেন। টাকার পরিমাণ অনুযায়ী নাকি মেলে তাঁর সুপারিশ সনদ বা প্রতিবেদন যাই-ই বলি না কেন। যিনি নিজে এত বড় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, তিনি কিভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার বা জবাবদিহির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেবেন? তাঁর তথাকথিত প্রতিবেদনের ওপরই ওই বিদ্যায়তনের এমপিওভুক্তি, সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষকদের পুরো বেতনপ্রাপ্তি–কত কিছু নির্ভর করে! আমরা অবশ্যই আশা করব, শেষোক্ত পরিদর্শন প্রক্রিয়াটির কথা যেন সত্য না হয়।

ছোটবেলায় সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ে একটা গল্প পড়েছিলাম। শিষ্যকে গুরু বলেছেন, আমার ধানক্ষেতকে বন্যার পানি থেকে ঠেকাও। উপায়ান্তর না দেখে শিষ্য নিজে শুয়ে আইল হয়ে গুরুর জমিতে পানি আসা ঠেকিয়েছে। এখন সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্র-শিক্ষকসহ আমরা সবার প্রতি সম্মান, সমীহ, স্নেহ ও দায়িত্বশীল হওয়ার ক্ষেত্রে আরো উন্নত হব। শুধু সিগারেট টানলে খাটো হয়, বাকি সবই বাড়ার কথা। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সহপাঠী এমনকি সহোদরদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার হেরফেরে আজ দেখি ভিন্নরূপ ও মাত্রায়। সরকার, সরকারের শিক্ষা দপ্তর, অভিভাবকমণ্ডলী, শিক্ষালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী–প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি-আচার-আচরণে বিস্তর বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। অথচ সুসমন্বয় ও দায়িত্ববোধের বিকাশ এখানে অনিবার্য এবং আকাঙ্ক্ষিত।

শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ সংখ্যাগত (নিউমেরিক্যাল) পরিমাণে শনৈঃ শনৈঃ গতিতে ও হারে বাড়লেও মূল্যমানের বিচারে প্রকৃত প্রস্তাবে (রিয়াল টার্মে) আনুপাতিক হারে বরাদ্দ ক্রমেই কমছে, এমনটি অবশ্যই প্রতীয়মান হয়। এখানে অসীম চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সসীম বরাদ্দের বনিবনা হচ্ছে না। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয় সরকারের কাঁধে ন্যস্ত হওয়ায় বেসরকারি দায়দায়িত্ববোধ যেমন হ্রাস পেয়েছে, সরকারি বিধিব্যবস্থার বিবরে শিক্ষার হালহকিকত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সর্বোপরি ক্ষেত্রবিশেষে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়েই চলছে কিংবা রক্তশূন্যতায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় এই শিক্ষাব্যবস্থার পুষ্টিমান ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে কী করে? কিভাবে তা হবে ফলবান ও প্রবৃদ্ধি-প্রশান্তি প্রদায়ক?

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সংস্কৃতি দুটি পর্যায়ে মারাত্মক অবক্ষয়ের উপসর্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। যে মানুষ বা ব্যবস্থা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্বে, তাদের সততা-নিষ্ঠা এতটা অপসৃয়মাণ ও ভঙ্গুর হলে সমাজে নিরাপত্তা ও আস্থার মূল্যবোধ বিকাশ দূরের কথা, টিকবে কোন ভরসায়! তাদের লোভ এতই উদগ্র যে কোনো কিছুতে তাদের নিরত রাখা যাচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব অপারগতা তাদের সাহস ও তৎপরতাকে তুঙ্গে তুলে দিচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পরীক্ষায় পাসের জন্য লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে যে নাজুক, নিরুৎসাহ ও স্পর্শকাতর আবহ সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য খোদ শিক্ষার মূল্যবোধকেই মূল্য দিতে হচ্ছে। শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রস্তাব ও বরাদ্দের পরিসংখ্যান শুনে গুণগত পরিবর্তনের প্রত্যাশার পরিবর্তে হতাশার হাটবাজার জমছে। অগৌণে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার, যদি আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চাই।

পল্লি অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান পরিবেশ, ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে শহরের শিক্ষায়তনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে, মফস্বল থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্ররাও শহরের শিক্ষায়তন থেকে পাস করাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেধার বিকাশ সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ হয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সৃষ্টির উদ্যোগ তথা অপয়া অবস্থা দেশ ও জাতির জন্য অশেষ দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে। মেধাশূন্য বিপুল জনগোষ্ঠী সম্পদ না হয়ে সহস্র সমস্যার শৈবালদামে পরিণত হয়ে দেশ ও জাতির বহমানতাকে ব্যাহত করতে থাকবে।

জাপানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষককে সবিশেষ সযত্ন ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার জন্য রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিবারে মা-বাবা কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ পরিবার দেশ ও সমাজে উপযুক্ত সদস্য সরবরাহে অমনোযোগী হতে পারেন না। সন্তানকে উপযুক্ত আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনাদাত্রী হিসেবে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে প্রথমত নিজেদের ও সংসারের স্বার্থে এবং প্রধানত পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে অবশ্যই মনোযোগী হবেন। আর এসব মানুষের দ্বারা, সব মানুষের জন্য, সব মানুষের সরকার পরিবার, সংসার, সমাজ ও দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃজনে-নিয়ন্ত্রণে, উদ্বুদ্ধকরণে, প্রণোদনে, প্রযত্ন প্রদানে অর্থনৈতিক রাজনীতি নিষ্ঠায়, ন্যায়-নির্ভরতায়, স্বচ্ছতায়, জবাবদিহিতায়, সুস্থ সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য-সখ্যতার সন্দেশ সুনিশ্চিত করবেন। সেই নিরিখে মানবসম্পদ তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নবযুগের যে শিক্ষার দরকার, সেই শিক্ষার পথে আমরা আছি কি না, বারবার তার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

লেখক : সরকারের সাবেক সচিব এবং এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান